বিভাগ - ক

রচনাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কী?
[What are the main characteristics of the Federal System of India.]

উত্তর। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারতের শাসনব্যবস্থা কাঠামোগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতিসম্পন্ন হলেও সংবিধানে 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। সংবিধানের ১(১)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, *India, that is Bharat, shall be a Union of States.* এখানে 'ইউনিয়ন' শব্দটি 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দের সমার্থক না-হওয়ায় অনেকে ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে 'একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' বলতে চাননি। সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি ডঃ আম্বেদকর বলেছেন যে, অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে, যেহেতু চুক্তি দ্বারা অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেনি, সেহেতু অঙ্গরাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার এই ব্যবস্থায় নেই।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(১) **লিখিত সংবিধান** : ভারতের সংবিধান গণপরিষদ দ্বারা রচিত ও গৃহীত এবং ভারতের সংবিধান— লিখিত সংবিধান। ভারত শাসন পরিচালনা বিষয়ে এটি একটি লিখিত দলিল। এতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) **সংবিধানের প্রাধান্য** : ভারতে সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। এখানে কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি সংবিধান-নির্দিষ্ট এক্তিয়ার ভঙ্গ করতে পারে না। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য— উভয়

সরকারকেই সংবিধানে বর্ণিত নির্দিষ্ট এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে ভারতের সংবিধান হল সমস্ত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের উৎস।

(৩) **সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সংমিশ্রণ** : ভারতের সংবিধান সম্পূর্ণভাবে সুপরিবর্তনীয় বা সম্পূর্ণভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। বরং উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। সংবিধানে এমন কতকগুলি ধারা আছে, যেগুলি সংসদ দ্বারা এককভাবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংশোধিত হয়। তবে যেসব বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেগুলি রাজ্য আইনসভা ও কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। ফলে, সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তা— উভয় ব্যবস্থাই আছে।

(৪) **কেন্দ্রপ্রবণতা** : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর কেন্দ্রপ্রবণতা। এখানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে এবং সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় তথা জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

(৫) **কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়** : যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল— কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন। ভারতেও সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য থাকলেও অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে যেসব ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, তা থেকে মনে হয় কেন্দ্রই কেবল শক্তিশালী রাষ্ট্র নয়, এখানে অঙ্গরাজ্যগুলিও শক্তিশালী অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে যেমন সহযোগিতা করে, তেমনি কোনো অঞ্চল বা অঙ্গরাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আবার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ দেখা দিলে উভয় সরকারই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেয়। তাই বলা যায় যে, ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

(৬) **ক্ষমতা বণ্টন** : যুক্তরাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা বণ্টন। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে সংবিধান অনুসারে ক্ষমতা বণ্টিত হয়েছে। অর্থাৎ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান। তিনটি তালিকা দ্বারা এই ক্ষমতাসমূহ বণ্টিত হয়েছে। যথা— কেন্দ্রীয়-তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকায় বর্ণিত বিষয়গুলি দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ক্ষমতা প্রয়োগের এক্তিয়ার ভোগ করে। আবার যুগ্ম তালিকায় বর্ণিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য— উভয়ই সমক্ষমতার অধিকারী।

(৭) **যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত** : যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় আদালত থাকে। ভারতে এইরূপ আদালত হল সুপ্রিমকোর্ট। সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা সুপ্রিমকোর্টই করে থাকে। অর্থাৎ, সংবিধানের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যাপারে কেন্দ্র ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বিরোধ বাধলে অথবা কেন্দ্রের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্যের ক্ষমতা-বণ্টনের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট তা নিষ্পত্তি করতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টের নিকট থেকে রাষ্ট্রপতি পরামর্শ নিতে পারেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেসব বৈশিষ্ট্য থাকার কথা, তার প্রায় সবগুলিই ভারতে রয়েছে। তাই, ভারতকে একটি 'যুক্তরাষ্ট্র' বলে অভিহিত করা যায়। ভারতের

ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করতে পারে না। তা ছাড়া, সংবিধানে সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে কোনো বিভাজন করা হয়নি।

প্রশ্ন : ৩। *ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণগুলি কী?*
[What are the reasons for the centralising tendency in Indian Federation?]

উত্তর। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ

সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বিশ্বের সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবল ঝোঁক। *অধ্যাপক কে. সি. হোয়ার* এই প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রতিককালে বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, অর্থনৈতিক মন্দা, উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত বিপ্লব প্রভৃতি কারণে একসঙ্গে চলার নীতি গ্রহণ না-করলে সার্বিক দিক থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। অপরদিকে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে না। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধির ও শক্তিবৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ভারতেও এইরূপ নানা কারণে কেন্দ্রপ্রবণতা লক্ষণীয়। এই কারণগুলি হল—

প্রথমত, ভারত স্বাধীনতা লাভ করে দুটি আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। যথা— ভারত ও পাকিস্তান। এই দেশভাগ বহু জটিল সমস্যার জন্ম দেয়। যেমন— সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্‌বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতি। এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে মজবুত করার। এইসব সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়েই কেন্দ্রপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, ভারতে কেন্দ্রপ্রবণতার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল— ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। প্রত্যেক দেশের সংবিধানেই সেই দেশের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের একটি ছাপ থাকে। আসলে রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে কোনো দেশ তার সাংবিধানিক ইমারত গড়ে তুলতে পারে না। ভারতের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন পর্যন্ত দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রথম থেকেই কেন্দ্র-প্রবণতার ঝোঁক ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে নবভারতের সংবিধান-রচয়িতাগণ ধরে রেখেছেন।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতালাভের আগে থেকেই দেশের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা ছিল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হলে দেশের স্বার্থ বিপদের সম্মুখীন হবে সন্দেহ নেই। অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নানারূপ বাধার সম্মুখীন হতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ বিপন্ন হলে দেশের অগ্রগতিও ব্যাহত হতে বাধ্য। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার কথা সংবিধান-প্রণেতাগণ ভেবেছিলেন।

চতুর্থত, স্বাধীনতালাভের সময় ভারত ছিল পৃথিবীর অন্যান্য দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এই কারণে প্রথম থেকেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সমগ্র ভারতে অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করে উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে অর্থের জোগানের ক্ষেত্রে যেমন বাধা কম আসবে, তেমনি পরিকল্পনামতো সমগ্র ভারতেই উন্নয়নের সমবণ্টন সম্ভব হবে। এইসব উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালনা ও তার সুফল প্রাপ্তির জন্য শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উল্লেখযোগ্য

যে, ভারতে পরিকল্পনা কমিশন যেসব বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে, তার ফলে কেন্দ্রপ্রবণতাও বেড়েছে।

পঞ্চমত, ভারতের জনকল্যাণমূলক আদর্শ— কেন্দ্রপ্রবণতা বাড়িয়েছে। কারণ, জনকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যেমন— তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেসব কমিশন বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ করা হয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকূলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ওইসব কমিশন সকল রাজ্যের জন্য একই ধরনের সুপারিশ করেছে। এর ফলে কেন্দ্রপ্রবণতা যথেষ্ট বেড়েছে।

ষষ্ঠত, কোনো যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার একটি অন্যতম কারণ হল— যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সক্রিয়তা। একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতির কারণে কেন্দ্রপ্রবণতা বিশেষভাবে বেড়েছে। কোনো দেশের জনগণই চায় না নিজের দেশ, অপর দেশের কাছে মাথা নীচু করুক। ভারতও যতবার এই ধরনের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, ততবারই জাতীয় দেশপ্রেম কেন্দ্রীয় শক্তিকে শক্তিশালী করেছে। উদাহরণ হিসাবে— ১৯৬২ সালের ভারত-চিন সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধ, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ প্রভৃতি পরিস্থিতির কথা বলা যায়।

সপ্তমত, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে দুটি ভয়ংকর সমস্যা হল— সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কারণ ছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উন্মাদনা। অর্থাৎ, স্বাধীনতার আগে থেকেই এই ভয়ংকর প্রবণতা ভারতের রাজনৈতিক পরিকাঠামোকে দুর্বল করে ফেলে। দ্বিখণ্ডিত হলেও ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের একেবারে অবসান ঘটেনি; বরং একই সূত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জাতীয় ঐক্য-বিরোধী এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সংবিধান-প্রণেতাগণ কেন্দ্রীয় শক্তি সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে *মরিস্-জোনস্* মন্তব্য করেছেন যে, স্বাধীনতার পর জাতীয় ঐক্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হল— বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মোকাবিলা করা। অতএব, ভারতে কেন্দ্রপ্রবণতার একটি অন্যতম কারণ হল— সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ভাষাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা প্রভৃতিকে প্রতিরোধ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজনীয়তা।

অষ্টমত, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে একে একে ঘটেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি। সমগ্র দেশ জুড়ে শিল্পায়ন ঘটেছে এবং দ্রুত ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে, একই সঙ্গে ঘটেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশাল উন্নতি। সমগ্র দেশ জুড়ে এই অভাবনীয় উন্নতির ফলে একটা জাতীয় গৌরব সার্বিক দিক থেকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

নবমত, ভারতে কেন্দ্রীয় বিচারব্যবস্থা— কেন্দ্রপ্রবণতার জন্য অনেকখানি দায়ী। ভারতে কেন্দ্রীয় আদালত তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত— সুপ্রিমকোর্ট বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছেন, যা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে আরও সাবলীল করে তুলেছে।

দশমত, সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি দেশকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আসতে হচ্ছে। এর ফলে আন্তর্জাতিকতায় বিনিময়ের ধারাটি বিবেচ্য হয়ে পড়েছে। এই ক্রমপ্রসারিত আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা— কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

একাদশত, অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজ্যগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রাজ্যের সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ খুবই কম, যা দিয়ে রাজ্য তার নিজের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে না। রাজ্য তার পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হয়। রাজ্যের অর্থনৈতিক

সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখার।

বিভাগ - গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। যুক্তরাষ্ট্র বলতে কী বোঝো?

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্র বলতে এমন এক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং সংবিধানে উল্লিখিত বিধি দ্বারা উভয় সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করে।

প্রশ্ন : ২। ভারতকে একটি "আধা-যুক্তরাষ্ট্র" বলে কে অভিহিত করেছেন?

উত্তর। অধ্যাপক কে.সি. হোয়ার ভারতকে একটি "আধা-যুক্তরাষ্ট্র" বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন : ৩। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) দু-প্রকার সরকারের অবস্থিতি— কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকার।
(খ) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।
(গ) একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।
(ঘ) দু-ধরনের সরকারের ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান।
(ঙ) দ্বি-নাগরিকতা প্রভৃতি।

প্রশ্ন : ৪। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কী-কী?

উত্তর। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) দু-ধরনের সরকারের অবস্থিতি— কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বা প্রাদেশিক সরকার।
(খ) লিখিত সংবিধান।
(গ) একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত— সুপ্রিমকোর্ট।
(ঘ) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা— উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ লোকসভা।
(ঙ) এক-নাগরিকত্ব প্রভৃতি।

প্রশ্ন : ৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য কী?

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন : ৬। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি কয়টি ও কী-কী?

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি দুটি। যথা—

প্রশ্ন : ১৪। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করো।

উত্তর। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার কয়েকটি কারণ হল—

(ক) দেশভাগজনিত সমস্যা, (খ) যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, (গ) ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, (ঘ) জনকল্যাণমূলক আদর্শ স্থাপন প্রভৃতি।

প্রশ্ন : ১৫। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত নাগরিকত্বের প্রকৃতি কী?

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হল দ্বি-নাগরিকত্বের স্বীকৃতি। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে এক-নাগরিকত্বের নীতিটি গৃহীত হয়েছে। এর কারণ হল, জাতীয় সংহতি বা জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা।

প্রশ্ন : ১৬। ভারতের সংবিধানের কত নং ধারায় আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ২৬৩নং ধারায় আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৭। আন্তঃরাজ্য পরিষদ কখন গঠন করা হয়?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ২৬৩নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি বিশেষ কোনো কারণে বা জনস্বার্থ-সম্পর্কিত বিশেষ পরিস্থিতিতে আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৮। বর্তমানে বিদ্যমান দুটি আন্তঃরাজ্য পরিষদের নাম লেখো।

উত্তর। বর্তমানে ভারতে দুটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ হল—

(ক) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষদ (The Central Council of Health),

(খ) কেন্দ্রীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিষদ (The Central Council of Local Self-Government)।

প্রশ্ন : ১৯। ভারতের সংবিধানের কত নং ধারায় অর্থ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ২৮০নং ধারায় অর্থ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ২০। অর্থ কমিশনের দুটি কাজ উল্লেখ করো।

উত্তর। অর্থ কমিশনের কাজ হল—

(ক) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত কর-রাজস্বের কে কত অংশ পাবে এবং নির্দিষ্টভাবে কোন্ রাজ্য কত অংশ পাবে, তা অর্থ কমিশন স্থির করে।

(খ) ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল থেকে কোন্ রাজ্য কতখানি অর্থ অনুদান হিসাবে পাবে, সে বিষয়ে অর্থ কমিশন নীতি নির্ধারণ করে।

প্রশ্ন : ২১। আঞ্চলিক পরিষদ কাদের নিয়ে গঠিত হয়?

উত্তর। আঞ্চলিক পরিষদ যাদের নিয়ে গঠিত হয়, তারা হলেন—

(ক) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা অন্য কোনো মন্ত্রী, যিনি রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন।

(খ) যে অঞ্চলে এই পরিষদ গঠিত হবে, সেই অঞ্চলের অন্তর্গত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীগণ এবং ওই রাজ্যগুলির প্রতিটি রাজ্য থেকে রাজ্যপাল দ্বারা মনোনীত দু-জন করে মন্ত্রী।

(ক) একত্রীকরণ পদ্ধতি।
(খ) বিভক্তিকরণ পদ্ধতি।

প্রশ্ন : ৭। *যুক্তরাষ্ট্র গঠনে একত্রীকরণ ও বিভক্তিকরণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি হল দুটি। যথা— একত্রীকরণ পদ্ধতি এবং বিভক্তিকরণ পদ্ধতি। 'একত্রীকরণ' বলতে বোঝায় কয়েকটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হওয়াকে। আবার, যখন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে, তখন তাকে 'বিভক্তিকরণ' পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন : ৮। *ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধান লিখিত। তা ছাড়া, ভারতীয় সংবিধানে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে।

প্রশ্ন : ৯। *ভারতের সংবিধানের ১(১)নং ধারায় কী বলা হয়েছে?*

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ১(১)নং ধারায় বলা হয়েছে *India, that is Bharat, shall be a Union of States.* অর্থাৎ, ভারতকে রাজ্যসমূহের একটি ইউনিয়ন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১০। *যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দু-ধরনের সরকারের প্রকৃতি কীরূপ?*

উত্তর। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দু-ধরনের সরকারের বিপরীতমুখী রূপ পরিলক্ষিত হয়। *প্রথমত,* উভয়প্রকার সরকারই চায় জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে এবং *দ্বিতীয়ত,* অঙ্গরাজ্যগুলি তাদের পৃথক অস্তিত্ব ও নিজস্বতা বজায় রাখতে চায়।

প্রশ্ন : ১১। *ভারতীয় সংবিধানের প্রাধান্য কীভাবে স্বীকৃত হয়েছে?*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে সংবিধানে বর্ণিত বিভিন্ন ধারায়। যেমন—

(ক) সংবিধানে বলা হয়েছে, সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part-III) উল্লিখিত মৌলিক অধিকার বিরোধী কোনো আইন রচিত হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্য— প্রতিটি সরকারেরই কাজের উৎস হল সংবিধান।

(গ) রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণের আগে সংবিধান মেনে কাজ করার শপথ নেন।

প্রশ্ন : ১২। *ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মূলত কয় ধরনের সরকার দেখা যায়?*

উত্তর। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মূলত তিন ধরনের সরকার দেখা যায়—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার,
(খ) প্রাদেশিক সরকার বা রাজ্য সরকার এবং
(গ) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য সরকার।

প্রশ্ন : ১৩। *কবে এবং কততম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা দিল্লিকে 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল' নাম দেওয়া হয়?*

উত্তর। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ৬৯-তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা দিল্লিকে 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল' নাম দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : ২২। *আঞ্চলিক পরিষদের দুটি কাজ উল্লেখ করো।*

উত্তর। আঞ্চলিক পরিষদের দুটি কাজ হল—

(ক) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত-সংক্রান্ত কোনো বিরোধ দেখা দিলে বা নদীর জলবন্টন নিয়ে যদি রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে সেইসব বিরোধের মীমাংসা করে আঞ্চলিক পরিষদ।

(খ) কোনো আঞ্চলিক পরিষদ এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা রচনা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন : ২৩। *আন্তঃরাজ্য পরিষদের দুটি কাজ উল্লেখ করো।*

উত্তর। আন্তঃরাজ্য পরিষদের দুটি কাজ হল—

(ক) রাজ্যগুলির মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে সেই বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করা এবং সেই বিরোধ মীমাংসার জন্য পরামর্শ (advising) দেওয়া।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান করা ও তার বিশ্লেষণ করা।

প্রশ্ন : ২৪। *ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় হল—

(ক) ভারতের প্রতিরক্ষা, (খ) কূটনৈতিক বিষয়, (গ) পারমাণবিক শক্তি এবং (ঘ) আন্তঃরাজ্য নদী-উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন।

প্রশ্ন : ২৫। *ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত রাজ্য তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত রাজ্যতালিকাভুক্ত চারটি বিষয় হল—

(ক) জনশৃঙ্খলা, (খ) জেল, (গ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং (ঘ) কৃষিজমির ওপর এস্টেট কর।

প্রশ্ন : ২৬। *ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত যুগ্ম তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত যুগ্ম তালিকাভুক্ত চারটি বিষয় হল—

(ক) ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা, (খ) ফৌজদারি আইন, (গ) বিদ্যুৎ এবং (ঘ) শিক্ষা।

প্রশ্ন 13. ভারতীয় সংবিধানে আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কীভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে?

উত্তর

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা বণ্টন'। ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আইন বিষয়ক ক্ষমতাও বণ্টন করা হয়েছে। **সংবিধানের সপ্তম তপশিল** (Seventh Schedule) **এবং ২৪৫-২৫৫ ধারায় আইন প্রণয়নমূলক ক্ষমতা বণ্টনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।** সপ্তম তপশিল সংযোজিত তিনটি তালিকা হল ① **কেন্দ্রীয় তালিকা** (Union List) ② **রাজ্য তালিকা** (State List) এবং ③ **যুগ্ম তালিকা** (Concurrent List)।

প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় যথাক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন প্রণয়নের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে এবং তৃতীয় তালিকায় যুগ্মভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইন প্রণয়নের বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০টি। এই বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থা, বিমান, রেল ও জাহাজ চলাচল, নাগরিকতা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র সংসদের রয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৬১। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা, ভূমিরাজস্ব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, সমবায় সমিতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি। রাজ্য এককভাবে এই বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের অধিকারী।

বর্তমানে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল ৫২। যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, ফৌজদারি আইনবিধি, সামাজিক বীমা, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রভৃতি। প্রসঙ্গত বলা যায়, যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু এই যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রের প্রণীত আইনের সঙ্গে রাজ্যের আইনের বিরোধ বাধলে রাজ্যের আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার এই ক্ষমতা বণ্টন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যতই বিস্তারিতভাবে তিনটি তালিকা প্রস্তুত করা যাক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত বিষয় তালিকাগুলিতে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এজন্য সংবিধানের ২৪৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় তালিকা, যুগ্ম তালিকা বা রাজ্য তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি সেসব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রের অধিকারে থাকবে। অর্থাৎ অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের।

প্র 9. কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক-এর ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

উত্তর

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছেন। রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা ছাড়াও কেন্দ্রীয় অনুদান, ঋণগ্রহণ এবং অর্থ কমিশনের মাধ্যমেও কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা বণ্টন দুটি পৃথক তালিকার মাধ্যমে করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকায় কর ধার্য করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। রাজ্য তালিকায় এই ক্ষমতা রাজ্য-আইনসভার হাতে ন্যস্ত। দুটি তালিকার বাইরে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ পার্লামেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো যুগ্ম তালিকা রাখা হয়নি।

- **কেন্দ্র তালিকা:** কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট ১৩টি রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আয়কর (কৃষি-আয় ছাড়া), কোম্পানি কর, উৎপাদন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় তালিকা থেকে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র এককভাবে সম্পূর্ণ ভোগ করে না। অনেক ক্ষেত্রে সংগৃহীত অর্থের আংশিক বা সামগ্রিক অংশ রাজ্যকে দেওয়া হয়।

- **রাজ্য তালিকা:** রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকার একক ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্য তালিকার বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভূমি রাজস্ব, কৃষি আয়ের ওপর কর, কৃষি জমির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কর, রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের অন্তঃশুল্ক, বিদ্যুৎ কর, আমোদপ্রমোদ ও যানবাহন কর ইত্যাদি।

- **অন্যান্য ব্যবস্থা:** কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুদানের একটি কার্যকরী ভূমিকা দেখা যায়। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই অনুদানের মাধ্যমে অর্থ সাহায্যের দুটি ক্ষেত্র আছে—① নির্দিষ্ট সাহায্য ② সাধারণ সাহায্য। এ ছাড়া সংবিধানের ২৯২ নং ধারায় কেন্দ্রকে দেশ ও বিদেশ থেকে ঋণগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলিকে শুধুমাত্র দেশের ভিতর থেকেই ঋণগ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তবে বিদেশি পুঁজি লগ্নির ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে সম্প্রতি নতুন আর্থিক নীতিতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের পর কেন্দ্রীয় প্রবণতার চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের।

প্রশ্ন 9. কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক-এর ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

উত্তর

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছেন। রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা ছাড়াও কেন্দ্রীয় অনুদান, ঋণগ্রহণ এবং অর্থ কমিশনের মাধ্যমেও কেন্দ্র-রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা বণ্টন দুটি পৃথক তালিকার মাধ্যমে করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকায় কর ধার্য করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। রাজ্য তালিকায় এই ক্ষমতা রাজ্য-আইনসভার হাতে ন্যস্ত। দুটি তালিকার বাইরে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ পার্লামেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো যুগ্ম তালিকা রাখা হয়নি।

- **কেন্দ্র তালিকা:** কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট ১৩টি রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আয়কর (কৃষি-আয় ছাড়া), কোম্পানি কর, উৎপাদন কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় তালিকা থেকে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র এককভাবে সম্পূর্ণ ভোগ করে না। অনেক ক্ষেত্রে সংগৃহীত অর্থের আংশিক বা সামগ্রিক অংশ রাজ্যকে দেওয়া হয়।
- **রাজ্য তালিকা:** রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকার একক ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্য তালিকার বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভূমি রাজস্ব, কৃষি আয়ের ওপর কর, কৃষি জমির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কর, রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের অন্তঃশুল্ক, বিদ্যুৎ কর, আমোদপ্রমোদ ও যানবাহন কর ইত্যাদি।
- **অন্যান্য ব্যবস্থা:** কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুদানের একটি কার্যকরী ভূমিকা দেখা যায়। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভারতেও রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই অনুদানের মাধ্যমে অর্থ সাহায্যের দুটি ক্ষেত্র আছে—① নির্দিষ্ট সাহায্য ② সাধারণ সাহায্য। এ ছাড়া সংবিধানের ২৯২ নং ধারায় কেন্দ্রকে দেশ ও বিদেশ থেকে ঋণগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলিকে শুধুমাত্র দেশের ভিতর থেকেই ঋণগ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তবে বিদেশি পুঁজি লগ্নির ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে সম্প্রতি নতুন আর্থিক নীতিতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের পর কেন্দ্রীয় প্রবণতার চিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে।

প্রশ্ন 10. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করো।

বিভাগ - ক

রচনাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করো।
[Point out the salient features of the Indian Party System.]

উত্তর। ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ হল রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্রের কথা ভাবা যায় না। **প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে যেসব প্রতিনিধিদের জনগণ নির্বাচিত করে রাজনৈতিক দল উভয়ের মধ্যে, অর্থাৎ, জনগণ ও প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে।** তাই কোনো গণতান্ত্রিক দেশ রাজনৈতিক দল ছাড়া চিন্তা করা অর্থহীন। তবে কোনো দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি রাজনৈতিক দলগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেকটি দেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ভারতেও রাজনৈতিক দলব্যবস্থার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) **দলব্যবস্থার ভিত্তি :** ভারতীয় সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের উল্লেখ থাকলেও রাজনৈতিক দলব্যবস্থার কোনো উল্লেখ নেই। ভারতে তাই দলব্যবস্থার ভিত্তি হল সংসদীয় গণতন্ত্র। রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করেই গড়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে সমাজ ও রাজনীতির প্রয়োজনের তাগিদেই দলব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে।

(খ) **দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত ও কর্মসূচিগত পার্থক্য :** ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত ও কর্মসূচিগত পার্থক্য রয়েছে। ভারতে এমন কিছু রাজনৈতিক দল আছে,

যারা স্থিতাবস্থা রক্ষা করতে চায়। আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক দল দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দ্বারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট। এইসব কারণে ভারতে রাজনৈতিক দলগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা— দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী ও মধ্যপন্থী।

(গ) **সাম্প্রদায়িক দলব্যবস্থা :** প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতে বেশিরভাগ দল ভোটের আগে কম-বেশি ধর্মীয় দিকটির আশ্রয় নিয়ে থাকে। ভোটের সময়ে লক্ষ করা যায় যে, যেসব অঞ্চলে যে-ধর্মের মানুষের প্রাধান্য রয়েছে, সেইসব অঞ্চলে সেই ধর্মের প্রতিনিধি দেওয়ার বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলি মাথায় রাখে। আবার ভোটের প্রচারের সময়ও সেই ধর্মের দিকে নজর রেখে তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ভিত্তিতে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই কাজকর্ম পরিচালনা করে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ভোটের সময় এই চিত্র— বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

(ঘ) **ভাষার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল :** ভারতে কোনো কোনো রাজ্যে ভাষার ওপর ভিত্তি করে কতকগুলি ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। এই দলগুলি আঞ্চলিক ভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে দলের কর্মসূচি ঠিক করে। এর উদাহরণ হল— তামিলনাড়ুর DMK, AIDMK প্রভৃতি।

(ঙ) **দলের অভ্যন্তরীণ কলহ :** ভারতে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যেমন আছে, তেমনি আছে অভ্যন্তরীণ বিবাদ। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য কোনো কোনো রাজনৈতিক দলে অনেকবার ভাঙন দেখা গেছে; আবার, অভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলেও কোনো কোনো রাজনৈতিক দলে ভাঙন দেখা গেছে।

(চ) **অগণতান্ত্রিক দলীয় ব্যবস্থা :** কিছু কিছু দলের সাংগঠনিক নির্বাচন সঠিক সময় হলেও বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক নির্বাচন ঠিক ঠিক সময় হয় না। এত বড়ো গণতান্ত্রিক দেশে এইরূপ দলীয় ত্রুটি অগণতান্ত্রিক দলীয় কাঠামোর বিষয়টিই ইঙ্গিত করে। এর সঙ্গে সব দলের সমর্থকদেরও গণতান্ত্রিক চেতনা দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য।

(ছ) **বেশিরভাগ দলের উৎপত্তি কংগ্রেস থেকে :** ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলি এসেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রাম— ভারতের জনমনের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এই ঐতিহ্যের দ্বারা জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্যও এককভাবে কাজ করেছিল। বর্তমানে জনতা দল, ভারতীয় জনতা দল, লোকদল প্রভৃতি দলের নেতৃবৃন্দ কোনো-না-কোনো সময়ে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। এইসব নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করেছে।

(জ) **ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল :** ভারতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কতকগুলি রাজনৈতিক দলও দেখা যায়। এই দলগুলি বিশিষ্ট কোনো একজন নেতা অথবা কয়েকজন নেতা একত্রে মিলে এইরূপ দলের ওপর প্রভাবপ্রতিপত্তি স্থাপন— ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর কয়েকটি উদাহরণ হল— লোকদল গড়ে ওঠে শ্রীচরণ সিং-কে কেন্দ্র করে। আবার মাদ্রাজে এ.আই.ডি.এম.কে. গড়ে ওঠে শ্রীরামচন্দ্রনকে কেন্দ্র করে।

(ঝ) **বিরোধী দলের অভাব :** ভারতে দীর্ঘকাল প্রভুত্বকারী দলব্যবস্থা বজায় থাকার জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে উঠতে পারেনি। সাম্প্রতিককালে এইরূপ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ভারতে বিরোধী দলগুলির মধ্যে অনৈক্য বর্তমান। বিরোধী দলগুলির অনৈক্য ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে একটি বড়ো বাধা।

প্রশ্ন : ২। ভারতে আঞ্চলিক দলের উদ্ভবের কারণগুলি আলোচনা করো।
[Discuss the causes of emergence of the Regional Parties.]

উত্তর : ভারতে আঞ্চলিক দলের উদ্ভবের কারণ

ভারতে বহুসংখ্যক আঞ্চলিক দল আছে। রাজনীতির ক্রমবিবর্তনের ধারায় ভারতে আঞ্চলিক দলগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উদাহরণ হল— (ক) তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে. এবং এ.আই.ডি.এম.কে., (খ) অন্ধ্রের তেলেগু দেশম, (গ) পাঞ্জাবের অকালি দল, (ঘ) মিজোরামের মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, (ঙ) অসমের অসম গণ-পরিষদ প্রভৃতি। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পিছনে কতকগুলি কারণ বিদ্যমান। এই কারণগুলি হল—

প্রথমত, ভারতে বহু ভাষাভাষী মানুষের সহ-অবস্থান হলেও ভাষাকে কেন্দ্র করে রাজনীতিক পরিবেশে বহুবার আঘাত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভাষাকে কেন্দ্র করে ভারতে আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব ঘটে। গড়ে ওঠে ভাষাভিত্তিক রাজনৈতিক দল। হিন্দিভাষার প্রাধান্যকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজ নিজ রাজ্যের ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে গড়ে ওঠে আঞ্চলিক দলগুলি। এইসব আঞ্চলিক দল সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংশ্লিষ্ট ভাষাকে প্রাধান্য দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দান করে। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা প্রজাসমিতি— এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত, কখনও-কখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ কোনো কোনো অঞ্চলে পিছিয়ে পড়ে। এর ফলে সেই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমতে থাকে এবং ওই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। এইসব দলের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম বিকাশের ফলেও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। অনেক সময় দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর অঞ্চলে মানুষের মনে আঞ্চলিক দল প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হলে ওই অঞ্চলে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলেরও প্রাধান্য বাড়ে। উল্লেখযোগ্য যে, এই ক্ষোভ অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতার পথে চালিত করে।

চতুর্থত, কখনও-কখনও বড়ো রাজনৈতিক দল থেকে বিচ্যুত কোনো নেতা বা নেত্রী কোনো একটি প্রদেশে তথা অঞ্চলে আঞ্চলিক দল গঠন করে থাকেন।

পঞ্চমত, বহু অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে ভারত। এইসব অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বদাই একটা নিজস্বতা কাজ করে। যখন কোনো অঞ্চলের মানুষ বা সম্প্রদায়ের মনে বঞ্চনার ধারণা গড়ে ওঠে এবং তারা যদি মনে করে যে, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত এবং তাদের সম্প্রদায় বিভিন্ন দিক থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত, তাহলে সেই অঞ্চলে আঞ্চলিক দলের উৎপত্তি ঘটে।

ষষ্ঠত, আবার কখনও-কখনও স্বতন্ত্র রাজ্যগঠনের দাবিকে কেন্দ্র করে একটি অঞ্চলের সম্প্রদায়ের মনে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আঞ্চলিক দলের সৃষ্টি হয়।

সপ্তমত, ভারতে ধর্মকে কেন্দ্র করেও আঞ্চলিক দল গঠিত হয়েছে। ধর্মীয় স্বতন্ত্রতার মধ্য দিয়ে নিজ ধর্মের দাবিপূরণের জন্য এরূপ রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসাবে পাঞ্জাবের অকালি দলের কথা বলা যায়।

অষ্টমত, অনেক সময় কোনো অঞ্চলের মানুষের জাতপাতগত কারণের ওপর ভিত্তি করে

পরিশেষে বলা যায় যে, সাম্প্রতিককালে ভারতের রাজনীতিতে জোটবদ্ধ রাজনীতির প্রাধান্য শুরু হওয়ায় জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি আঞ্চলিক দলগুলিকে প্রভাবিত করে জোট গঠন করে এবং ক্ষমতা দখলের জন্য আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে আঞ্চলিক দলগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়ছে।

প্রশ্ন : ৩। ভারতে জোটবদ্ধ রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা আলোচনা করো।
[Discuss the nature and trends of Coalition Politics in India.]

উত্তর। ভারতে জোটবদ্ধ রাজনীতির প্রকৃতি ও প্রবণতা

যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বা উপদল রাজনীতিতে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তথা ক্ষমতাদখলের জন্য সংগঠিত হয়, তখন তাকে বলে জোটবদ্ধ রাজনীতি (Coalition Politics)। রাজনীতিতে জোট গড়ে উঠলেও ওইসব দল বা গোষ্ঠী বা উপদলগুলির মধ্যে বিভেদ ও ঐকমত্য— উভয়ই বর্তমান থাকে। তবে এইরূপ রাজনীতিতে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়।

● **প্রকৃতি :**

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে ভারতে জোটবদ্ধ রাজনীতির প্রসার ঘটতে শুরু করে। জোটবদ্ধ রাজনীতি দ্বারা ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা যেমন প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি এই ধরনের রাজনীতি প্রভাব ফেলেছে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। সাধারণভাবে জোট দু-রকমের হতে পারে। যথা— (ক) নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে গঠিত জোট এবং (খ) নির্বাচনের পরবর্তীকালে গঠিত জোট।

(ক) **নির্বাচনের আগে গঠিত জোট :** যখন কতকগুলি সাধারণ কর্মসূচি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে জোটবদ্ধ হয় এবং নির্বাচনে জয়লাভের জন্য লড়াই করে, তখন এই ধরনের জোট গঠিত হয়। এই জোট নির্বাচনে বিজয়প্রাপ্ত হলে যে সরকার গঠন করে, তাকে বলে জোটবদ্ধ সরকার। এই ধরনের জোটের উদাহরণ হল— চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ওড়িশার জোটবদ্ধ সরকার। এ ছাড়া অন্যতম উদাহরণ হল— পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের জোট।

(খ) **নির্বাচনের পরবর্তীকালে গঠিত জোট :** কখনও-কখনও দেখা যায় যে, নির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এই অবস্থায় কতকগুলি রাজনৈতিক দল কতকগুলি সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে জোটগঠন করতে পারে। এই জোটের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল আইনসভা দখল করা। এই ধরনের জোটকে অনেকে অগণতান্ত্রিক মনে করেন। কারণ ভোটদাতারা নিজ নিজ দলের প্রতি সমর্থন জানায় এবং নিজ দলকে অন্য দল থেকে স্বতন্ত্র

মনে করে। নির্বাচনের পর যদি কোনো দল এমন কোনো দলের সঙ্গে জোট বাঁধে, যাকে প্রথম দলের সমর্থকরা পছন্দ করত না বা নির্বাচনের আগে তাঁদের বিরুদ্ধেই তারা সরব ছিল, জোটবদ্ধ হলে এইসব সমর্থকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা গণতন্ত্রের বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। এই ধরনের জোট হল অবৈধ জোট। কারণ, এখানে নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন থাকে না। বিহার, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে এই ধরনের জোট ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর গড়ে উঠেছিল।

ক্ষমতাগত দিক থেকে আবার জোট দু-ভাগে বিভক্ত। যথা— (ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রভাবিত জোট এবং (খ) সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রভাবিত জোট। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রভাবিত জোটের স্থায়িত্ব বেশি। কারণ, একটি প্রধান দলের শৃঙ্খলা ও নীতি-নির্ধারণ দ্বারা অন্যান্য জোটবদ্ধ দলগুলি প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং সিদ্ধান্ত মেনে চলে। অপরদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রভাবিত জোট হলে তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয় না; বিভিন্ন কোন্দলে জোটের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের জোটকে আবার বহুদলীয় জোটও বলা যায়।

কখনও-কখনও দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে এবং দায়িত্ব অর্পণের ভিত্তিতে জোটকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) বাইরে থেকে সমর্থনজনিত জোট এবং (খ) আনুষ্ঠানিক জোট। অনেক সময় কোনো বড়ো রাজনৈতিক দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না-পারে এবং সরকার গড়তে ব্যর্থ হয়, এরকম ক্ষেত্রে তারা কোনো একটি বা একাধিক দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গঠন করতে পারে। এক্ষেত্রে বড়ো দলটির মধ্য থেকেই মন্ত্রীদের নিযুক্ত করা হয়। জোটবদ্ধ অন্য দল এর কোনো ভাগ নেয় না; তারা বাইরে থেকে কেবল সরকারকে সমর্থন করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখে। অর্থাৎ, বাইরে থেকে সমর্থনকারী দল বা দলগুলি দায়িত্বের কোনো ভাগ নেয় না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক জোটের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, অন্যান্য দলগুলি সুস্পষ্টভাবে তাদের দায়িত্বের ভাগ সম্পর্কে প্রথমেই বোঝাপড়া করে নেয়। দায়িত্বের ভাগে বোঝাপড়া যথাযথ না-হলে জোট গড়ে ওঠে না বা জোট ভেঙে যায়।

আবার মতাদর্শের ভিত্তিতেও দু-ধরনের জোট গড়ে উঠতে পারে। যথা— (ক) একই মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা জোট এবং (খ) ভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা জোট। একই ধরনের মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা জোটের স্থায়িত্ব দীর্ঘ হতে পারে। এই জোট দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে হতে পারে, আবার, বামপন্থীদের মধ্যেও হতে পারে। সমমতাদর্শ হওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে তেমন বিরোধ দেখা দেয় না। দেখা দিলেও সহজেই তারা তা মিটিয়ে ফেলতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী জোট সরকার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অপরদিকে ভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে জোট গড়ে উঠলে তাদের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন তথা দায়িত্ব বন্টনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিরোধ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বেশি প্রাধান্য পায় এবং দলীয় নীতি গৌণ হয়ে পড়ে। এই ধরনের জোট প্রয়োজনে নির্বাচনী আদর্শকে পর্যন্ত ক্ষমতালাভের আশায় বিসর্জন দিতে পারে। তাই, এই ধরনের জোটের স্থায়িত্বকাল একেবারেই নগণ্য।

● প্রবণতা :

ভারতে জোটবদ্ধ রাজনীতির প্রবণতা আলোচনা করলে যে বিষয়গুলি সাধারণভাবে পাওয়া যায়, তা হল—

প্রথমত, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর জোটবদ্ধ রাজনীতির প্রাবল্য দেখা গেলেও এর সূত্রপাত ঘটে কেরালায়। সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে পি.এস.পি মিলিত হয়ে জোটবদ্ধ সরকার গঠন করেছিল। আবার ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ওই রাজ্যে আর. এস. পি-র সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে

কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সরকার বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। এরপর কংগ্রেস ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি কমিউনিস্ট বিরোধী দল এবং পি এস পি-র সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গঠন করে।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে জোট সরকার গঠিত হয়। এরপর ১৯৬৯ সালেও জোট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দলের নেতৃত্বে কতকগুলি বামপন্থী দল নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকার। বিহারে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহামায়া প্রসাদ সিং অ-কংগ্রেসী দলসমূহের সমর্থনে জোট সরকার গঠন করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আবার কয়েকটি দলের সমর্থনে বিহারে জোট সরকার গঠন করেন কংগ্রেসের হরিহর সিং। এইভাবে ওড়িশা, হরিয়ানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে জোটবদ্ধ সরকার গঠিত হয়।

তৃতীয়ত, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে এবং জনতা সরকার ক্ষমতাসীন হয়। লোকসভায় তাদের সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও জনতা সরকারকে কংগ্রেস-বিরোধী জোট সরকার বলা যায়। কারণ, তারা অকালি দল এবং এ আই ডি এম কে দলকেও সরকারে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। তবে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের লোকসভা নির্বাচনের পর আধিপত্যশীল দলীয় ব্যবস্থা সরকার গঠনের মতো সমর্থন না-পাওয়ায় রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার গঠিত হয় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্বে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে একাদশ লোকসভা নির্বাচনে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে গঠিত হয় সম্মিলিত সরকার। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে এই সরকারেরও পতন ঘটে। এরপর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে দেবেগৌড়া সরকার এবং ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্দ্রকুমার গুজরাল সরকার ছিল জোট সরকার। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বাদশ এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন দলের সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের লোকসভা নির্বাচনে ইউ.পি.এ. সরকার হল একটি জোট সরকার। অনুরূপভাবে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের লোকসভার নির্বাচনে ইউ.পি.এ.-এর জোট গড়ে ওঠে এবং তারা সরকার গঠন করে। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি হল— কংগ্রেস, ডি.এম.কে., টি.এম.সি., এন.সি.পি., জে.এম.এম. প্রভৃতি।

বিভাগ - খ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *রাজনৈতিক দলত্যাগ বলতে কী বোঝায়? রাজনৈতিক দলত্যাগের কারণগুলি আলোচনা করো।*

[What do you mean by Political Defection ? Discuss the reasons for Political Defection.]

উত্তর। দলত্যাগ

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো একটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক নিয়ে রাজ্য আইনসভা বা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে চলে যায় এবং যে দলের প্রতীক নিয়ে সে নির্বাচিত হয়েছিল, সেই দলের সঙ্গে সকল সংস্রব ছিন্ন করে, তাহলে তাকে বলা হয় রাজনৈতিক দলত্যাগ (Political Defection)।

• **দলত্যাগের কারণ :**

কোনো রাজনৈতিক নেতা ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের কারণেই নিজ দলীয় মতাদর্শ ও প্রতীক ত্যাগ করে অন্য দলে চলে যায়। এই দলত্যাগের পিছনে একাধিক কারণ কাজ করে। যথা—

প্রথমত, বিপুল পরিমাণে অর্থপ্রাপ্তির আকর্ষণ— অনেককে রাজনৈতিক দলত্যাগে উৎসাহিত করে।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের পর অনেক সময় নির্বাচিত সাংসদ বা বিধায়ক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তথা মন্ত্রীত্ব পাওয়ার আকাঙ্খা মেটাতে না-পারলে দলত্যাগ করে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক মর্যাদা এবং সরকারি সুবিধা আদায়ের ইচ্ছা— দলত্যাগের একটি অন্যতম কারণ।

তৃতীয়ত, ভারতে দলত্যাগের একটি বিশেষ কারণ হল— ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থার অবস্থান। বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকার কারণে একটি নির্দিষ্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে অপর দল থেকে বিধায়ক ভাঙিয়ে এনে নিজ দলের গরিষ্ঠতা বাড়াতে এবং মন্ত্রীসভা গঠন করতে সচেষ্ট। কাজেই বহুদলীয় ব্যবস্থায় অনিশ্চিত পরিস্থিতি থেকেই দলত্যাগ ঘটে থাকে।

চতুর্থত, আবার দলীয় কোন্দল, অর্থাৎ, নিজ দলের মধ্যে নানা বিরোধ লেগে থাকলে এবং দলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠলে দলত্যাগের ঘটনা ঘটে।

পঞ্চমত, দলের সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ও কার্যসূচিগত মনোমালিন্য— দলত্যাগের একটি কারণ। যদি দলের সদস্যদের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ লেগে থাকে এবং দলের প্রতি আনুগত্য শিথিল হয়, তাহলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেও বিশেষ কষ্টস্বীকার করতে হয় না। এক্ষেত্রে অন্য রাজনৈতিক দলের সুবিধাবাদী হাতছানি দলত্যাগ ঘটায়।

ষষ্ঠত, ভারতে দলত্যাগ প্রতিরোধের জন্য পূর্বে কোনো চেষ্টা করা হয়নি বলে যত সুবিধা-সুবিধার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, দলত্যাগও তত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপদলীয় বিরোধ থেকেও দলত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। মনোনয়ন প্রদানের ব্যাপারে ভোটের আগে এই উপদলীয় বিরোধের সূত্রপাত ঘটে এবং নির্বাচনের পর সেই বিরোধ স্পষ্ট আকার নেয় ও দলত্যাগে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : ২। ***জাতপাতের রাজনীতিকরণ বলতে কী বোঝো? জাতপাতের রাজনীতিকরণের ওপর একটি টীকা লেখো।***
[What do you mean by Politicisation of Caste ? Write a short note on Politicisation of Caste.]

উত্তর : জাতপাতের রাজনীতিকরণ

স্বাধীনতার পর ভারতের রাজনীতিতে জাতপাত ও রাজনীতির মধ্যে এক নিকট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। জাতব্যবস্থার মধ্যে রাজনীতি তার সংশ্লেষণের বিষয়সমূহ যেমন খুঁজে নেয়, তেমনি জাতিগুলিও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাজনীতিকে কাজে লাগায়। ফলে রাজনীতি ও জাতপাতের মধ্যে যে নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাকে বলা হয় জাতপাতের রাজনীতিকরণ। এর ফলে রাজনীতিক ব্যক্তিগণ জাতব্যবস্থাকে উদ্দীপিত করে থাকে।

Caste in Indian Politics নামক গ্রন্থে রজনী কোঠারি বলেছেন যে, ভারতে বর্তমান সময়ে জাত এক নতুন শক্তি ধারণ করে সুসংহতভাবে বিকশিত হয়েছে। জাতপাতের রাজনীতিকরণ হল এর মূল কারণ। ভারতের রাজনীতিতে জনমত গড়ে তোলার স্বার্থে নানা

ধরনের সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে জাত-সংগঠনগুলিও ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ, রাজনীতি এবং জাতের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতপাতের রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া কাজ করে।

জাতপাত ও রাজনীতি একে অপরের পরিপূরক হয়ে রাজনীতিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করে চলেছে। রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী তার ক্ষমতালাভের অস্ত্র হিসাবে জাতগোষ্ঠীগুলিকে যেমন উদ্দীপিত করে নিজ স্বার্থে কাজে লাগায়, তেমনি জাতগুলিও চায় তাদের সদস্যদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার সম্প্রসারণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার দিকটি সাফল্য লাভ করুক।

জাতপাত ও রাজনীতির এইরূপ পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাত-কাঠামো সাম্প্রতিককালে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গে যেমন স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি ভারতের রাজনৈতিক জীবনে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নির্মাণে, লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা, পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিতে তাদের অধিকার স্থাপনে সাফল্যলাভ করেছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, জাতপাতসহ ব্যবস্থা সার্বিক দিক থেকে যে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে তা নয়, জাতব্যবস্থা সার্বিক দিক থেকে রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে না বা জাতপাতের প্রভাব রাজনীতিতে সর্বাত্মক নয়। অন্যান্য কতকগুলি বিষয়, রাজনৈতিক দলগুলির কার্যসূচিগত ও মতাদর্শগত প্রতিশ্রুতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রভৃতি দ্বারা রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়।

প্রশ্ন : ৩। *আঞ্চলিক দল বলতে কী বোঝো? জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃত হতে হলে বর্তমানে একটি রাজনৈতিক দলের কী-কী শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক?*
[What do you mean by Regional Parties ? What are the conditions required at present for a political party to be recognised as a National Party ?]

উত্তর। আঞ্চলিক দল

যখন কোনো একটি রাজনৈতিক দল কোনো একটি রাজ্য অথবা কোনো একটি রাজ্যের অন্তর্গত কোনো একটি অঞ্চলের কোনো ধর্মীয় বা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য বা আঞ্চলিক স্বার্থপূরণের জন্য রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে আঞ্চলিক দল (Regional Party) বলে।

● **জাতীয় দল :**

কোনো দলকে জাতীয় দল (National Party) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় মূলত পার্লামেন্টের নির্বাচনে পাওয়া আসন, সেই দলটির প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ বা রাজ্যগুলি থেকে পার্লামেন্টে পাওয়া সর্বনিম্ন আসন প্রভৃতি দেখা হয়। বর্তমানে কোনো রাজনৈতিক দলকে 'জাতীয় দল' হিসাবে স্বীকৃতি অর্জনের জন্য কতকগুলি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা—

(ক) ওই দলকে লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে অথবা চারটি বা তারও বেশি রাজ্যে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে কমপক্ষে ছয় শতাংশ ভোট পেতে হবে।

(খ) কোনো একটি রাজ্য অথবা একের বেশি রাজ্য থেকে লোকসভায় কমপক্ষে চারটি আসন পেতে হবে। অথবা,

(গ) লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে তিনটি আলাদা আলাদা রাজ্য থেকে কমপক্ষে দুই শতাংশ আসন পেতে হবে। অথবা,

(ঘ) ওই দলকে চারটি পৃথক রাজ্যে রাজ্যদল রূপে স্বীকৃতিলাভ করতে হবে।

বিভাগ - গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *রাজনৈতিক দল কাকে বলে?*

উত্তর। রাজনৈতিক দল বলতে বোঝায় এমন একটি সংগঠনকে, যার সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সম্মিলিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে চায়।

প্রশ্ন : ২। *রাজনৈতিক দলের দুটি কাজ উল্লেখ করো।*

উত্তর। রাজনৈতিক দলের দুটি কাজ হল—

(ক) রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম করা।

(খ) রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে দলীয় মতবাদ এবং দলের কার্যসূচি জানিয়ে ও প্রচার চালিয়ে জনসম্মতি লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি কাজ করে।

প্রশ্ন : ৩। *ভারতের সংবিধানে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার কী কোনো উল্লেখ আছে?*

উত্তর। ভারতের সংবিধানে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার কোনো উল্লেখ নেই। ভারতে দলব্যবস্থার ভিত্তি হল সংসদীয় গণতন্ত্র। রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করেই গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন : ৪। *ভারতে দলব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে কেন?*

উত্তর। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে সমাজ ও রাজনীতির প্রয়োজনের তাগিদেই দলব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে।

প্রশ্ন : ৫। *ভারতে দলব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।*

উত্তর। ভারতে দলব্যবস্থার দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—

(ক) ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত ও কার্যসূচিগত পার্থক্য রয়েছে। ভারতে এমন কিছু রাজনৈতিক দল আছে, যারা স্থিতাবস্থা রক্ষা করতে চায়। আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক দল দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দ্বারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট।

(খ) ভারতে কিছু কিছু দলের সাংগঠনিক নির্বাচন সঠিক সময়ে হলেও বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক নির্বাচন যথাসময়ে হয় না। দলের এই ত্রুটি অগণতান্ত্রিক দলীয় কাঠামোর বিষয়টিই ইঙ্গিত করে।

প্রশ্ন : ৬। ভাষাভিত্তিক দুটি রাজনৈতিক দলের নাম লেখো।

উত্তর। ভাষাভিত্তিক দুটি রাজনৈতিক দলের নাম হল—

(ক) ডি.এম.কে. এবং (খ) এ.আই.এ.ডি.এম.কে.।

প্রশ্ন : ৭। ভারতে কয়েকটি আঞ্চলিক দলের নাম লেখো।

উত্তর। ভারতে কয়েকটি আঞ্চলিক দল হল—

(ক) তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে. এবং এ.আই.এ.ডি.এম.কে।

(খ) পাঞ্জাবের অকালি দল,

(গ) অন্ধ্রের তেলেগু দেশম,

(ঘ) মিজোরামের মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৮। আঞ্চলিক দল কাকে বলে?

উত্তর। যখন কোনো একটি রাজনৈতিক দল কোনো একটি রাজ্য অথবা কোনো একটি রাজ্যের অন্তর্গত কোনো একটি অঞ্চলের কোনো ধর্মীয় বা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য বা আঞ্চলিক স্বার্থপূরণের জন্য রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে আঞ্চলিক দল বলে।

প্রশ্ন : ৯। আঞ্চলিক দলের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর। আঞ্চলিক দলের দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—

(১) আঞ্চলিক দলগুলি একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী এবং সুনির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের মঙ্গলের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। সমগ্র জাতির জন্য চিন্তা-ভাবনা করে না।

(২) কোনো একজন ব্যক্তি বা কোনো একটি গোষ্ঠীর উদ্যোগে আঞ্চলিক দল গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন : ১০। NDA পুরো কথাটি লেখো।

উত্তর। NDA-এর পুরো কথাটি হল— National Democratic Alliance।

প্রশ্ন : ১১। UPA-এর পুরো কথাটি লেখো।

উত্তর। UPA-এর পুরো কথাটি হল— United Progressive Alliance।

প্রশ্ন : ১২। জোটবদ্ধ রাজনীতি কাকে বলে?

উত্তর। যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বা উপদল রাজনীতিতে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য- সাধনের জন্য অর্থাৎ, ক্ষমতা দখলের জন্য সংগঠিত হয়, তখন তাকে বলে জোটবদ্ধ রাজনীতি (Coalition Politics)। রাজনীতিতে জোট গড়ে উঠলেও ওইসব দল বা গোষ্ঠী বা উপদলগুলির মধ্যে বিভেদ ও ঐকমত্য— উভয়ই বর্তমান থাকে।

প্রশ্ন : ১৩। ভারতে আঞ্চলিক দলের উদ্ভবের দুটি কারণ উল্লেখ করো।

উত্তর। ভারতে আঞ্চলিক দলের উদ্ভবের দুটি কারণ হল—

(ক) ভাষাকে কেন্দ্র করে ভারতে আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব ঘটে। গড়ে ওঠে ভাষাভিত্তিক

রাজনৈতিক দল। হিন্দিভাষার প্রাধান্যকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজ নিজ রাজ্যের ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে গড়ে ওঠে আঞ্চলিক দল।

(খ) অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম বিকাশের ফলেও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে।

প্রশ্ন : ১৪। *ক্ষমতাগত দিক থেকে জোটকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী-কী?*

উত্তর। ক্ষমতাগত দিক থেকে জোটকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রভাবিত জোট এবং

(খ) সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রভাবিত জোট।

প্রশ্ন : ১৫। *দায়িত্বের দিক থেকে জোটকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী-কী?*

উত্তর। দায়িত্বপালন এবং দায়িত্ব অর্পণের দিক থেকে জোটকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) বাইরে থেকে সমর্থনজনিত জোট এবং

(খ) আনুষ্ঠানিক জোট।

প্রশ্ন : ১৬। *সংবিধানের কত নং সংশোধন দ্বারা দলব্যবস্থা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে?*

উত্তর। সংবিধানের ৫২-তম সংশোধন দ্বারা রাজনৈতিক দলব্যবস্থা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রশ্ন : ১৭। *রাজ্যস্তরে সরকার গঠন করেছে এমন দুটি আঞ্চলিক দলের নাম লেখো।*

উত্তর। রাজ্যস্তরে সরকার গঠন করেছে এমন দুটি আঞ্চলিক দল হল—

(ক) অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু দেশম, (খ) সমাজবাদী পার্টি।

প্রশ্ন : ১৮। *সাধারণত দলব্যবস্থাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী-কী?*

উত্তর। দলব্যবস্থাকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) একদলীয় ব্যবস্থা, (খ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা এবং (গ) বহুদলীয় ব্যবস্থা।

প্রশ্ন : ১৯। *কোন্ ধরনের দলব্যবস্থা ভারতে বর্তমানে দেখা যায় ?*

উত্তর। ভারতে বর্তমানে বহুদলীয় ব্যবস্থা দেখা যায়। এখানে জাতীয় দল যেমন আছে, তেমনি অনেক আঞ্চলিক দলও আছে।

প্রশ্ন : ২০। *কেন ভারতে বহু রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে?*

উত্তর। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যধারার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলসমূহ কাজ করে। এই কারণে কোনো কোনো দল চায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে, আবার কোনো কোনো দল বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন চায়। কাজেই বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক যে বৈসাদৃশ্য গড়ে ওঠে, তার ফলে দেখা দেয় দলীয় বিভেদ। এই কারণে ভারতে বহু রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন : ২১। *রাজনৈতিক দলত্যাগ বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো একটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক নিয়ে রাজ্য আইনসভা বা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে চলে যায় এবং যে দলের প্রতীক নিয়ে সে নির্বাচিত হয়েছিল, সেই দলের সঙ্গে সকল সংস্রব ছিন্ন করে, তাহলে তাকে বলা হয় রাজনৈতিক দলত্যাগ (Political Defection)।

প্রশ্ন : ২২। দলত্যাগের দুটি কারণ উল্লেখ করো।

উত্তর। দলত্যাগের দুটি কারণ হল—

(ক) বিপুল পরিমাণে অর্থ পাওয়ার আকর্ষণ অনেককে রাজনৈতিক দলত্যাগে উৎসাহিত করে।

(খ) নিজ দলের মধ্যে নানা বিরোধ লেগে থাকলে এবং দলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠলে দলত্যাগের ঘটনা ঘটে।

প্রশ্ন : ২৩। কবে এবং কততম সংবিধান সংশোধন দ্বারা দলত্যাগ-বিরোধী আইন পাশ হয়?

উত্তর। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ৫২-তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা রাজনৈতিক দলত্যাগ রোধের জন্য দলত্যাগ-বিরোধী আইন পাশ হয়।

প্রশ্ন : ২৪। ডি এম কে এবং এ আই এ ডি এম কে-এর পুরো কথা কী?

উত্তর। ডি এম কে-এর পুরো কথা হল— 'দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম' এবং এ আই এ ডি এম কে-এর পুরো কথা হল— 'অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম'।

প্রশ্ন : ২৫। 'ভারতীয় জনতা পার্টি' ও 'তৃণমূল কংগ্রেস'-এর উদ্ভব হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

উত্তর। 'ভারতীয় জনতা পার্টি' র উদ্ভব ঘটে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এবং 'তৃণমূল কংগ্রেস'-এর উদ্ভব ঘটে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।

প্রশ্ন : ২৬। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দুটি মূল উদ্দেশ্য উল্লেখ করো।

উত্তর। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দুটি মূল উদ্দেশ্য হল— (ক) সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনসাধন, (খ) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করা।